মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

হিরন্ময় চক্রবর্তী

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের মতো আকস্মিকভাবে না হলেও জীবনের কোনো না কোনো পর্বে আমরা সকলেইমৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করতে বাধ্য হই। সেই সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে, ধর্মরূপী বকের উক্তি অনুসারে আমরা মৃত্যুর ধ্রুবত্ব বিস্মৃত হয়ে সংসারে জীবনের নিরন্তর দাবিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। মৃত্যুর তুলনায় জন্মও কম রহস্যময় নয়। জন্ম ও মৃত্যুর গণ্ডি দিয়ে ঘেরা এই পার্থিব জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হয়েই আমাদের অধিকাংশ কাল কেটে গেলেও ওই গভীর বিপরীত সীমান্তে কোনো লোকান্তরে আমাদের বিদেহী অস্তিত্বেরও এক জের চলে কিনা, সে সম্পর্কে কখনো কখনো কৌতূহল বোধ করি বইকী। কিন্তু মৃত্যুকে জীবনের অমোঘ পরিণতি বলে মেনে নিতে সকলেই প্রস্তুত হলেও জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতি জটিল বিষয়ে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস দেশ, কাল, পাত্র ও গোষ্ঠী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়েছে। ইহজীবন মানুষের কাছে যতটা প্রত্যক্ষ, পরজীবন আদৌ নয়। তাই তার অস্তিত্ব নিয়ে কল্পনা, অনুমান, সংশয় ইত্যাদির অবকাশও প্রচুর। মৃত্যুকে কেউ তুলনা করেছেন এমন এক অজানা মহাদেশের সঙ্গে যেখান থেকে কোনো পর্যটকই আর ফিরে আসতে পারেনি। যদি পারত তবে তার ভ্রমণ বিবরণ নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক হত, হয়তো অনেক সংশয়েরও নিরসন হত তখন।

আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু এমন একজনের কাহিনি আছে যিনি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারান্তে আবার ফিরে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং মৃত্যু তাঁর কাছে মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট রহস্য উদঘাটিত করে তাঁকে অমরত্বে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি হলেন নচিকেতা। হয়তো নচিকেতা উপাখ্যান এক রূপকমাত্র। মৃত্যু সম্পর্কে সনাতনভীতিকে জয় করে তার মুখোমুখি হতে পারলে তবেই সন্ধান মেলে --- এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই হয়তো সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক কিশোরের মৃত্যুতীর্থ পরিক্রমার অবতারণা করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর মুখ দিয়ে নচিকেতার উদ্দেশ্যে যে সকল বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা যে জীবন, জগৎ ও আত্মা সম্পর্কে মানুষের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম উপলব্ধিরই এক পরিণত প্রকাশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব এই প্রাচীন আখ্যানের পুনরালোচনায় আমরা চিরন্তন সত্যের এক কালোত্তীর্ণ মহিমময় ব্যাখ্যার প্রত্যাশাই করতে পারি।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে বাজশ্রবস মুনি যখন দক্ষিণাস্বরূপ কয়েকটি জরাজীর্ণ গাভীকে দান করতে উদ্যত হলেন তখন ওই অসাধু প্রয়াস সন্দর্শনে মর্মাহত পুত্র নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা না করে পারলেননা যে, সর্বস্বদানের এই যজ্ঞে পিতা তাকে কার হস্তে সমর্পন করছেন। পৌনঃপুনিক প্রশ্নবাণে উত্যক্ত হয়ে শিথিলজিহ্ব পিতা সহসা তাঁকে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে দানের অঙ্গীকার করে বসলেন। অতঃপর সত্যরক্ষার্থে সত্যশীল তণ নচিকেতা যাত্রা করলেন মৃত্যুরাজ্যে। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্যজনক সাক্ষাৎকারকে উপলক্ষ্য করে ভাবীকাল পেল এক অমৃতময় আত্মরহস্যব্যাখ্যান। মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের চিরন্তন কৌতূহল যে তার গূঢ়তম আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসারও জনক, সেই কাহিনিতে তারই পরিচয় পাই।

অগ্নিতুল্য তেজোরাশি নিয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকুমার মৃত্যুলোকে যে গৃহে প্রবেশ করেন সেখানেই যেন আগুন জ্বলে ওঠে, আর তাঁর জ্বলন্ত তাপ প্রশমনার্থে জল ও পাদ্যার্ঘ নিয়ে সকলে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু যমরাজ নিজেই তখন অন্যত্র গেছেন। কাজে কাজেই নচিকেতা মৃত্যুনিলয়ে ত্রিরাত্রি উপবাসে কাটালেন। কিন্তু গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি উপবাসী থাকলে সে

অজ্ঞ গৃহস্বামীর আশা, প্রতীক্ষা, সজ্জনসঙ্গ, সুনৃতবাক্য, দান ও যজ্ঞের ফল পুত্র ও পশু সবই ধবংস পায়। তাই ঘরে ফিরে সব শুনেই মৃত্যু আতিথেয়তার ত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক একটি উপবাসক্লিষ্ট রজনীর বিনিময়ে নচিকেতাকে একটি করে বরদান তরে তিনি ঋণমুক্ত হতে চাইলেন।

তাঁর সম্পর্কে পিতা যেন উদ্বেগমুক্ত ও প্রসন্নচিত্ত হন ও মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনান্তে যেন তাঁকে সাদরে বরণ করেন, যমের কাছে নচিকেতার এই নিতান্ত মানবিক যদিচ গতানুগতিক প্রাথমিক বর প্রার্থনা অচির স্বীকৃত হল। কেমন করে ও কোন অগ্নি প্রজ্বালকদের দ্বারা ভয়াক্ষুধাতৃষ্ণা জরামৃত্যুর অতীত স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী বা দেবতা হলেও অমরত্ব লাভ করা যায়, নচিকেতার এই দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাকে ভোগলিপ্সু মানবতার উর্ধচিন্তার প্রথম ধাপ বলা চলে। স্বর্গাদি লোকের উৎস্বরূপ অগ্নির রহস্য ও তৎসংশ্লিষ্ট যজ্ঞে বিধির খুঁটিনাটি মৃত্যুর কাছ থেকে নচিকেতা অক্লেশে শিখে নিলেন। তাঁর এই আগ্রহ ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যম তাঁকে একটি অতিরিক্ত বর দিলেন---ওই অগ্নি এখন থেকে নচিকেতার নামেই খ্যাত হবে। যম তাঁকে কর্মজ্ঞানও উপহার দিলেন। কিন্তু এই দুটি বরের অভীপ্সিত ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ যে নচিকেতার কাছে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার, তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য যে সুদুরতম ও গুঢ়তম রহস্যভেদ, সেকথাস্পষ্ট হয় তাঁর তৃতীয় জিজ্ঞাসা থেকে। নচিকেতার ওই অন্ত্য - প্রার্থনার অন্তর্নিহিত আস্পৃহার মধ্যে যেন মানবতার অপাপবিদ্ধ কৈশোরের আকুতিই শুনতে পাই। --- মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে সম্পর্কে এই যে এক সংশয়ের কথা সুবিদিত, কেউ বলে যে, দেহমনেন্দ্রিয়বুদ্ধি হতে স্বতন্ত্র আত্মা বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে, আবার কেউ যে তা নেই। হে মৃত্যুরাজ, তুমি তো জান, তুমি বুঝিয়ে দাও।

কিন্তু অধিকারী বিচার না করে হেলায় বিতরণের মতো সুলভ জ্ঞান তো এ নয়। যমরাজ তাই অনেক চেষ্টাকরলেন নচিকেতাকে নিরস্ত ও বিক্ষিপ্ত করতে। বিষয়টি যে অতীব সূক্ষ্ম এমনকী প্রাচীনকালের দেবতারাও যে এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি, সে কথা শুনিয়েও নচিকেতাকে দমিয়ে দিতে পারা গেল না। তখন মৃত্যুরাজ তাঁর সামনে প্রলোভনের সমারোহ তুলে ধরলেন---শতজীবী পুত্রপৌত্রাদি,স্বর্ণ, হস্তী, অশ্ব, গোধন, বিশাল সাম্রাজ্য, দীর্ঘজীবন, যদৃচ্ছা বাসনাপূর্তি, রথবাহিতা সতূর্যা মর্ত্যবাসীর অলভ্য মোহিনীদের সেবা ইত্যাদি। কিন্তু নচিকেতা মূল জিজ্ঞাসায় অটল। কী হবে এই সব ভোগোপকরণে যখন আত্মার তুলনায় এরা সবই অসার, অনিত্য ও মৃত্যুর অধীন। মানুষ তো বিত্তে তৃপ্ত হবার নয়। তাছাড়া নচিকেতার মতো সত্যধৃতিবান প্রশ্নকর্তা পেয়ে মুগ্ধ হয়ে একসময় যমরাজ নিজেই স্বীকার করে বসলেন যে কর্মফল কখনো শাশ্বত হতে পারে না। কারণ তা ক্ষণস্থায়ী। সম্পদের মতোই লোকে তার অন্বেষণ করে, অধ্রুবের দ্বারা যে সুখ মেলে তা অনিত্য হতে বাধ্য। শাশ্বত নিধি যিনি সেই পরব্রহ্মকে যজ্ঞাদির দ্বারা পাওয়া যায় না। যজ্ঞের ফলে লভ্য স্বর্গসুখ ঐহিক সুখের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হলেও তার অবসান একদিন হবেই। যম নিজে একথা জেনেও অনিত্য দ্রব্যের সাহায্যে একদা নচিকেতাগ্নির সেবা করে যে মৃত্যুরাজের পদ বা তথাকথিত শাশ্বত স্বর্গ পেয়েছেন, তা অবশ্যই আপেক্ষিক ভাবে চিরন্তন। কিন্তু ধীরমতি নচিকেতা সংসারের সকল ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করে তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন ও পরমবস্তুর অভীপ্সায় অটুট রইলেন। মৃত্যু তখন পরীক্ষার ফলে সন্তষ্ট হয়ে নচিকেতাকে উপযুক্ত জ্ঞানে আত্মার রহস্য শেখালেন এবং যোগবিধি ও ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষা দিলেন।

লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালির উপাখ্যানে আমরা যেমন দেখি যে, বিদ্ধাচরণের পরিণাম দৈবী রোষ ও সমূহ বিপর্যয় এবং আত্মসমর্পণের ফল দাক্ষিণ্য ও ঐহিক সমৃদ্ধি নচিকেতার কাহিনির মধ্যে যেন তার একটি বিপরীতসুর লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুরাজ বলেছেন যে অধিকাংশ লোকই শ্রেয়কে ছেড়ে অনিত্য সুখের আশায় প্রেয়কে বরণ করে। তারা পার্থিব ভোগসুখ, ধনৈশ্বর্য ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব মোহে অন্ধ হয়ে লোকান্তরকে উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করে ঐহিক প্রাপ্তি আঁকড়ে পড়ে থাকে। এইসব অজ্ঞজনের কাছে সাম্পরায় বা পরলোকের পথ ধরা দেয় না। আত্মার সূক্ষ্ম ও গূঢ় তত্ত্ব তাদের কাছে চিরদিনই অজানা থেকে যায়, আর পরিণামে তারা বারংবার মৃত্যুর বিস্তৃত জালে ধরা পড়ে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অনন্তচক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ পায়। এই সব মূঢ়গণ অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়েও তাদের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের গর্ব করে, ফলে তারা বঙ্কিম পথে ঘুরে ঘুরে অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করে।

মৃত্যু আরো বললেন যে, তর্কের দ্বারা আত্মাকে বোঝা যায় না, এটি শুনে শেখার বিষয়। একমাত্র ব্রহ্মবিদ অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্ত আচার্যই আত্মার রহস্য শেখাতে পারেন। কিন্তু এর রহস্যের ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতাযেমন মাত্র অল্প সংখ্যক আশ্চর্য বক্তারই আছে, তেমনি অনেক শ্রোতার মধ্য হতে এক - আধজন আশ্চর্য কুশল শিষ্যই এর উপলব্ধি করতে

সক্ষম হন। এমনই এক যোগ্য শিষ্য হলেন নচিকেতা, তাই তিনি সংসারের সব আকর্ষণ তুচ্ছ করে যমের কাছে বলতে পারলেন--- পাপ-পুণ্য, কার্য-কারণ, অতীত-ভবিষ্যতের উর্ধ্বে যা আছে, তাই শেখাও।

জন্ম মৃত্যুর রহস্য মানেই দেহাতীত অস্তিত্বের রহস্য অথাৎ আত্মার রহস্য। আর আত্মা শব্দটির ব্যঞ্জনা এতব্যাপক, গভীর, গূঢ় ও সূক্ষ্ম যে তার প্রসঙ্গ মানেই অনন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বোচচ ও সর্বোত্তম রহস্য। ভূমার অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ নচিকেতার কাছে এই রহস্যের মর্ম উদঘাটন করতে গিয়ে মৃত্যুরাজ শুধু আত্মার প্রকৃতিই ব্যাখ্যা করেননি, আত্মাকে কীভাবে জানা যায় সে কথাও কখনো আভাসে - ইঙ্গিতে কখনো বা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

জন্ম - মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার ধর্ম বোঝাতে গিয়ে যমরাজ বললেন যে, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। দেহকে বড় করে তাঁর বিনাশ ঘটানো যায় না। তিনি নিত্য, অজ, শাশ্বত, পুরাণ। তিনি সুক্ষ্ম হতেও সুক্ষ্মতর, আবার মহৎ হতেও মহীয়ান তিনি সর্বগ। অশরীরী এই আত্মা নশ্বর শরীরে দৃঢ়ভাবে স্থিত, তিনি সর্বব্যাপী। আত্মা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা বিকারের অতীত, অতএব ক্ষয় বা পরিবর্তন ও বিনাশের উর্ধ্বে। যাঁর ক্ষয় বা বিনাশ নেই, তিনি শাশ্বত ও সেইহেতু অনাদি ও অনন্ত এবং পরিণামরহিত। আত্মার মৃত্যু নেই, মরণশীল হচেছ দেহ। অতএব মৃত্যু বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় দেহধারণের যারা হেতু স্বরূপ সেই অবিদ্যা, বাসনা ও কর্মফলকে। জ্ঞানলাভে র পূর্বেই মানুষ মরণশীল, জ্ঞানলাভের পর সে অমরত্ব লাভ করে।

এই দেহ রথমাত্র, আত্মাকে তার রথী বলে জানা উচিত। বুদ্ধি হল সারথি মন বলগা, ইন্দ্রিয়বর্গ রথাশ্ব, আর ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয়সমূহ হল পথ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আসলে আত্মারই গোচরীভূত হয়, তাঁর অজানা কিছুই নেই। একাদশ-দ্বারযুক্ত এই দেহনগরের রাজা হলেন আত্মা। শুধু মানবদেহ কেন, বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে এক অভিন্ন ও অবিভাজ্য আত্মাই বিভিন্নরূপে বিরাজ করছেন। আত্মাই প্রাণাদি বায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য পরিচালনা করেন ওতাদের পূজা গ্রহণ করেন। মানুষ প্রাণ বা অপান বায়ুর সাহায্যে বাঁচে না বাঁচে বায়ু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সমাবেশ যাঁর সেবার জন্য উদ্দিষ্ট সেই আত্মারই সাহায্যে।

এই আত্মা ব্রহ্ম থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম কীট পর্যন্ত সর্বভূতে গূঢ় হয়ে বিরাজমান, অথচ তিনি প্রকাশিত হন না, কারণ অজ্ঞান ও মোহের অন্তরালে তিনি প্রচছন্ন। কিন্তু তাঁর দীপ্তিতে সবকিছু আলোকিত। এই আত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুষরূপে অন্তরাত্মরূপে ও জীবের ভূতভব্যের ঈশান বা প্রভুরূপে অধূমক জ্যোতির মতো দীপ্যমান হয়ে সর্বদা সর্বজীবের হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে বা হৃদপদ্মের আকাশে অবস্থান করেছেন। তিনি কোনো দীপ্তি বিকীরণ না করলেও সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁদের সূক্ষ্ম - শুদ্ধ - ব্যগ্র বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে দেখতে পান।

আত্মার দর্শন পেতে গেলে চাই আন্তর প্রস্তুতি। যে ব্যক্তি কদাচার হতে বিরত হয়নি বা ইন্দিয়গ্রামকে সংযত এবং মনকে শান্ত ও সমাহিত করতে পারে নি, তার পক্ষে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে লাভ করা অসম্ভব। যার বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন নয়, মন যার অসংযত, যে সদা অশুচি, ইন্দ্রিয়বর্গ যার দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য, সে আত্মাকে পায় না এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সংসারে পতিত হয়।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আত্ম বেদাধ্যয়ন, মেধা কিংবা নিছক বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা লভ্য নন। কেবল অম্বিক্ষু সাধক যখন বাসনারহিত হয়ে শুধুমাত্র আত্মারই সন্ধানে মগ্ন থাকেন, তখন আত্মার দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ আত্মা নিজেই এইরূপ লোকের নিকট আপন স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

যাবতীয় বাহ্যবস্তু থেকে মনকে সরিয়ে একাগ্র করতে পারলে আত্মার ধ্যানের দ্বারা নিবিড়তম কন্দরে নিহিত আত্মাকে বুদ্ধির মধ্যে অবস্থিত বলে অনুভব করা যায়। আত্মাকে তো কেউ চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, পায় মনকে নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধির দ্বারা ও নিরবচিছন্ন ধ্যানের সাহায্যে। মনসমেত চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যখন শান্ত এবং বুদ্ধি যখন নিষ্ক্রিয় হয়, সেই অবস্থাকে বলে পরমাগতি। ইন্দ্রিয়ের এই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বা ধারণকে বলে যোগ, কিন্তু একে স্থায়ী করতেগেলে সতর্কতার প্রয়োজন, কেননা এ যেমন আসে তেমনি চলেও যায়।

দেহের মধ্যে অবস্থিত হলেও আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর কেন? এর কারণ, পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে এমন বহির্মুখ করে গড়েছেন যে তাদের সাহায্যে কেবল বাহ্যবস্তুকেই জানা যায়, অন্তরাত্মাকে নয়। তৎসত্ত্বেও কোনো কোনো ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্রোতের মুখ উজানে ঘুরিয়ে দেবার মতো করে বাহ্যবস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অভিনিবেশটি সরিয়ে

নিয়ে অন্তর্মুখ হতে পারেন ও প্রত্যগাত্মার দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণ বাসনাতৃপ্তিকল্পে বাহ্যবস্তুর অলীক অে স্বষণেই মত্ত হয়ে মৃত্যুর শিকার হয়।
এই অন্তর্মুখীনতার সাহায্যে আত্মদর্শনের মধ্যে একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। সাধনার লক্ষ্য হল প্রত্যক্ আত্মা, যার অর্থ সার বস্তু বা আন্তর তত্ত্ব। অন্যদৃষ্টিতে দেখলে যে তত্ত্বটি কারণ বা বীজস্বরূপ, তাকে তার কার্য বা পরিণাম বা প্রকাশের প্রত্যগাত্মা বলা চলে। আবার একথাও সত্য যে, কার্য অপেক্ষা কারণ একটি সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর তত্ত্ব। অতএব কোনো কিছুর অন্তরাত্মা বা সারবস্তু তার তুলনায় সূক্ষ্মতর ও মহত্তর এবং, বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তারসৃষ্টির হেতুস্বরূপ। এইভ াবে আত্মাকে দুটি দিক দিয়ে ধারণা করা যেতে পারে। এক, সৃষ্টি বা জন্য-জনক সম্পর্কে আলোকে কার্য থেকে কারণে প্রত্য াবর্তনের দিক দিয়ে এবং দুই, স্থুল হতে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হতে মহত্বে উজিয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে।
বিশ্বের মূলে একটিই পরমতত্ত্ব থাকলেও সৃষ্টিতে তার প্রকাশ, বিকাশ বা বিবর্তন রূপ নিয়েছে আরো অনেক তত্ত্বকে আশ্রয় করে। এই তত্ত্বগুলির পরস্পরের মধ্যে এক জন্য-জনক সম্পর্ক বর্তমান, আবার তেমনি একটি সূক্ষ্ম হতে স্থুলের পর্যায়ত্রমে এরা বিন্যস্ত। অথবা, যেন একের পর এক কোষ সাজানো আছে এক সূক্ষ্মতার পর্যায়ত্রমঅনুসারে। এই ত্রমবিন্যস্ত তত্ত্বপর ম্পরায় যে কোনোটিই তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ সূক্ষ্মতর তত্ত্বের পরিমাণস্বরূপ এবং সেই সঙ্গে আবার অব্যবহিত পরবতী স্থূলতর তত্ত্বটির কারণস্বরূপ। এইভাবে বিশ্বজগৎকে যেন এক বিরাটবিবৃত্ত কার্য - কারণ শৃঙ্খল বলে বিবেচনা করা চলে যার একপ্রান্তে রয়েছে আদিতম ও সূক্ষ্মতম কারণ ও অন্যপ্রান্তেরয়েছে স্থূলতম কার্য বা প্রকাশ। সাধনার লক্ষ্য হল উজান পথে সূক্ষ্মতর সকল পর্যায় অতিত্রম করে চৈতন্যের বীজময় সূক্ষ্মতম স্তরে বা প্রত্যগাত্মায় উপনীত হওয়া।
যে হেতু বিষয় হতেই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, অতএব বিষয় ইন্দ্রিয়াপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও মহত্তর এবং সেই সঙ্গে তা ইন্দ্রিয়ের আত্ম াস্বরূপ। এইভাবে পর্যায়ত্রমে বিষয় হতে মন, মন হতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ হলেন সূক্ষ্মতর মহত্তর সেই সঙ্গে পুর্বোত্তটির আত্মাও বটে। হিরণ্যগর্ভকে যে মহৎ বলা হয় তার কারণ তিনি হলেন মহত্তম। অব্যত্ত অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি বা ম ায়ার প্রথম জাতক এই মহৎ। তিনি বুদ্ধি ও ত্রিয়াসম্পন্ন। আর মহৎকেও অতিত্রম করলে যাঁর দেখা মেলে সেই অব্যত্ত হলেন নিখিলবিশ্বের বীজসত্তা, নামরূপের বিকারাতীত অবস্থা, সকল কারণ ও কার্যের ভব্যর্থের সময়ে তিনি পরমাত্মায় ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট। তাঁর অপর নাম হলে অব্যাকৃতি, আকাশ ইত্যাদি। এই অব্যত্তের ও অতীত যিনি, তিনিই হলেন পুষ, সকল কারণের, সকল কিছুর প্রত্যগাত্মা ও সর্বাপেক্ষা মহৎ। সব কিছুকে পূর্ণ করেন বলেই তাঁকে বলা হয় পুষ। আর এই পুষই হচেছন চরম ও পরম তত্ত্ব, সূক্ষ্মতম ও গূঢ়তম উপলব্ধির বিষয়। তার পরে আর কিছুই নেই, তিনি সবকিছুর সীমা, পরাগতি।
প্রাণাদি সকলে যখন ঘুমায়, তখনো এই পুষ জেগে থেকে অবিদ্যা সাহায্যে কামনার বস্তুসকল নির্মাণ করেন। অব্যত্ত থেকে জড়বস্তু পর্যন্ত নিয়ে যে সনাতন সংসারবৃক্ষ তার মূল উর্ধ্বে, শাখা নিম্নে ! সেই মূল হলেন শুদ্ধ ব্রহ্ম। নিখিলজগৎ এই ব্রহ্ম হতেই সৃষ্টি, উদ্যতবজ্রসদৃশ তাঁকেই অমৃত বলা হয়ে থাকে। তিনিই লোকসমূহের আশ্রয়, তাঁকে কেউ পার হতে প ারে না।
এই পুষ বা আত্মারূপ পরতত্ত্বের উপলব্ধির অভিযানে সূক্ষ্মতর আরোহত্রমে প্রাজ্ঞসাধক একের পর একস্থুলতত্ত্বকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতত্ত্বে টেনে নেবেন, যথা ইন্দ্রিয়কে তিনি ডুবিয়ে দেবেন মনের মধ্যে, মনকে বুদ্ধির মধ্যেএবং বুদ্ধিকে মহৎ অ াত্মা বা হিরণ্যগর্ভের মধ্যে (অর্থাৎ বুদ্ধিকে করে তুলবেন হিরণ্যগর্ভের মতো নির্মল), আর অবশেষে এই মহৎ আত্মাকেও নিমজ্জিত করবেন মূল বা শান্ত আত্মা যেখানে কোনো অবস্থান্ত বা বিকার নেই এবং যা সকলের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বুদ্ধ্যা দি পরিণামের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজমান। অজ্ঞতাপ্রসূত ও দুঃখমূল নামরূপকর্মকে পুযের মধ্যে এইভাবে মিশিয়ে দিয়ে মুত্তিল াভের এই পথকে জ্ঞানীরা ক্ষুরধারার মতোই কঠিন ও দুর্গম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অজ্ঞানের ঘোর নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠে শ্রেষ্ঠকে এইভাবে লাভ করার পর উত্তম আচার্যের নিকট শিক্ষালাভকরে আত্মার অনন্ত রহস্য উপলব্ধি করতে হয়।
আত্মার সম্বন্ধে এই উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন যে নামরূপের বিকারের মধ্যেও যেমন তিনি আছেন, তেমনি আবার সকল বিকারের উর্ধ্বে তাঁর এক স্বরূপ সত্য আছে। অবশ্য প্রথম উপলব্ধিটি ঘটলে, দ্বিতীয়টিও ঘটবে। অগ্নিযেমন দাহ্যবস্তুভেদে এবং বায়ু যেমন আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে সর্বভূতান্তরাত্মাও তেমনি মূলত এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও জীবভেদে তাঁর রূপের বৈচিত্র্য ঘটে, আবার তাঁর অরূপ সত্তাও বর্তমান।

অবিনশ্বর আত্মাকে জানলে ভয় দূর হয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শাশ্বত শান্তি ও সুখ লাভ করেন। সূর্যের আলোতে দৃষ্টিগোচর সকল বস্তু আলোকিত হলেও যেমন তাদের বাহ্যদোষ সূর্যকে লিপ্ত করতে পারে না, তেমনি সর্বভূতান্তরাত্মাও জগতের বাহ্য দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন। আমিই সেই সর্বব্যপী মহান পরমাত্মা এই কথা জেনে তাই ধীরব্যক্তি শোকোত্তীর্ণ হন। এই অভেদদর্শনই আত্মদর্শনের সার কথা। পর্বতের উচ্চপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির জল যেমন শতধারায় চতুর্দিকে গড়িয়ে পড়েও হারিয়ে যায়, তেমনি নামরূপের বিভিন্নতায় বিভ্রান্ত যে অজ্ঞব্যক্তি দেহবৈচিত্রের আকর্ষণে সাড়াদিয়ে সেই ভিন্ন দেহীদের পিছনেই ছোটে সে-ও পরিণামে বারংবার জন্ম গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন দেহের খাঁচায় বন্দী হতে বাধ্য হয়।
তাই ধাতুপ্রসাদ বা মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমের সঙ্গে চাই বাসনামুক্তি। এই বাসনা আত্মার ধর্ম নয়, তা অবিদ্যার ফসল এবং ভ্রান্তবুদ্ধিই তার আশ্রয়। আত্মার স্বরূপ সত্য দর্শনের ফলে হৃদাশ্রিত বাসনা সকল খসে পড়ে, কেননা আত্মজ্ঞান হলে বাসনার বস্তু বলে আর কিছুই থাকে না। সকল বেদান্তেরই এই শিক্ষা যে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদদর্শনের ফলে অবিদ্যাপ্রসুত ভ্রান্তসংস্কার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুদৃঢ় হৃদগ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয় এবং মানুষ ইহলোকেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয় ও অমরত্ব অর্জন করে। মৃত্যুর আকর যে অবিদ্যা, বাসনা ও কর্ম, তার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্তি ঘটে,সংসারের যাতায়াতের প্রয়োজন লোপ পায়। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বেই অর্থাৎ ধরণীর বুকে থাকতে থাকতেই এই আত্মোপলব্ধি কর্তব্য নতুন পুনরায় দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী। তার কারণ, আত্মাকে দর্পণে মুখের ন্যায় দেখা যায় কেবল নিজের মধ্যে, অথ্যাৎ দেহী মানুষের মধ্যে লোকান্তরে তার উপবিষ্ট অস্পষ্ট। অবশ্য ব্রহ্মলোকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধনা ভিন্ন সেই লোকেও পৌঁছোনো যায় না।
মৃত্যুর পর মানুষের কী হয় ? ইহলোকেই ব্রহ্ম হয়ে যারা ব্রহ্মলাভে অসমর্থ হয় তাদের সম্পর্কে যম বলেছেন যে, মানুষের হৃদয় থেকে যে একশো একটি নাড়ী বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে সুষুম্না নামক নাড়ীটি মূর্ধা ভেদ করেনির্গত হয়েছে। মৃত্যুর সময় হৃদিস্থিত আত্মাকে যদি ওই নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করে নিঙ্ক্রান্ত হওয়া যায়, তবে আপেক্ষিক অমরত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না উপাদানসমূহ বিশ্বে লীন হচ্ছে তদবধি অমর হওয়া যায়। অপরপক্ষে অন্যনাড়ী দিয়ে আত্মার নিঙ্গমন হলে সংসারে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তখন ইহজীবনের কর্মের ফল ও জ্ঞানের প্রকৃতি অনুযায়ী অজ্ঞজনেরা পুনরায় উপযুক্ত দেহধারণার্থে জননীগর্ভে প্রবেশ করে, আর নিকৃষ্টতর ব্যক্তিরা এমন কী বৃক্ষাদি অচলবস্তুতেও পর্যবসিত হয়।
'তারপর মৃত্যুকথিত এই বিদ্যা ও যাবতীয় যোগবিধি লাভ করিয়া নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন, এইরূপে আত্মার প্রকৃতি জানিতে পারিলে অন্যেরাও তাহাই হইবেন।'
'মৃত্যুকথিত নচিকেতার সনাতন উপাখ্যান শুনিয়া আবৃত্তি করিয়া মেধাবী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহিমা লাভ করেন।'
'যে কেহ এই পরম গুহ্য বিষয় ব্রাহ্মণসভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নসহকারে শুনাইবেন তিনিই অমরত্ব লাভ করিবেন।'

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com